অমর্ত্য সেন

স্বপন মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুখবন্ধ

ভুবনবরেণ্য অধ্যাপক অমর্ত্য সেন অর্থশাস্ত্রীদের কাছে এবং বিদ্বৎসমাজে অর্থশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শী, তাত্ত্বিক ও মৌলিক গবেষক হিসেবে স্বীকৃত। তিনি সারা জীবন বিশ্বের সেই সমস্ত প্রান্তিক মানুষদের কথা গুরুত্বের সঙ্গে বলেছেন যারা ক্ষুধা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, বেরোজগার আর বঞ্চনাকে নিত্যসঙ্গী করে বেঁচে আছে। তিনি সেই সব বিরল ব্যক্তিত্বের একজন যিনি একই সঙ্গে নির্ভুল গাণিতিক বিশ্লেষণে তত্ত্বকে যুক্তির বাঁধনে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আবার খুব সহজ-সরল বাস্তব সত্যকে তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে প্রাঞ্জলভাবে সবার বোধগম্য করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। অধ্যাপক সেন সারা বিশ্ব ঘুরে তাঁর তীক্ষ্ণধী—বিশ্লেষণী যুক্তিতে বুঝিয়ে বলছেন, পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা দূর করা সম্ভব — এ দাবি ভাববাদী, স্বপ্নবিলাসীর অলীক কল্পনা নয়। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অধ্যাপক সেনকে উপেক্ষা না করে গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করছে। সাম্প্রতিক কালে আর কোনো ব্যক্তি এককভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এমন আন্তর্জাতিক প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

অধ্যাপক সেনের কথা সাধারণ মানুষ জানতে চায়। অথচ, বর্তমান অর্থশাস্ত্র উচ্চতর গণিত-নির্ভর জটিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করায়, অর্থনীতি, বিশেষজ্ঞদের চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের বোধের দুয়ারে পৌঁছাতে পারেনা। কিন্তু অধ্যাপক সেনের কথা একেবারেই বোঝা যায়না, এ কথা সত্যি নয়, বরং মিথ্যে। এই মিথ্যে তাঁরাই প্রচার করেন, যাঁরা তাঁর কথাকে আড়াল করে রাখতে চান—সে চেষ্টা সারা পৃথিবীতে ছিল এবং আছে।

আমি স্টেট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আহ্বানে 'বিকাশ' পত্রিকায় অধ্যাপক সেনের কাজের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখবার সময় তাঁর সমস্ত লেখা ও বক্তব্য আমার সাধ্যমতো বোঝার চেষ্টা করি। এরপর চতুষ্কোণ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অধ্যাপক সেনের কাজের উপর আমার বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

অধ্যাপক সেনের মাতামহ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এবং অধ্যাপক সেনের মা শ্রীমতী অমিতা সেনের সঙ্গে আমার পিতৃদেবের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাই ছোটোবেলা থেকেই এই পরিবারের নানা কথা আমার শোনা ও জানা। পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক-গবেষক ও বহু আকরগ্রন্থ প্রণেতা, অগ্রজপ্রতিম ড. নিতাই বসুর আনুকূল্যে আমিও শ্রীমতী অমিতা সেনের ঘরের ছেলে হয়ে যাই। শান্তিনিকেতনে প্রতীচীতে বসেই নিতাইদা এবং বউদি, সুলেখিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু আমাকে অধ্যাপক সেনের জীবন ও কাজের উপর সাধারণ মানুষের জন্য বাংলায় একটি বই লেখায় অনুপ্রাণিত করেন।

প্রতীচী ট্রাস্টের শ্রী কুমার রাণা, শ্রী স্যমন্তক দাস, শ্রী সৌমিক মুখার্জি, শ্রী অরবিন্দ নন্দী, আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক শ্রী রণেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী মধুশ্রী চ্যাটার্জি, অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের বোন শ্রীমতী সুপূর্ণা দত্ত, অধ্যাপক সেনের সম্পর্কিত বোন শ্রীমতী মীরা রায় ও শ্রীমতী রত্নমালা রায় আমাকে বইটি লিখতে নানাভাবে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সঙ্গেও আমার কয়েকবার সাক্ষাতের ও আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর আনুকূল্য থেকেও আমি বঞ্চিত হইনি। অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের পুত্র কবীর এবং কন্যা ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আলোচনায় আমি সমৃদ্ধ হয়েছি।

অধ্যাপক সেনের কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের কথা মনে রেখে এই বইতে অধ্যাপক সেনের কথাগুলোকেই আমি সাজিয়ে-গুছিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। ভোরের আলোর মতো অন্ধকারবিদারী তাঁর বক্তব্য। আমি কোথাও হয়তো গাছের ডালের আড়াল সরিয়ে সে আলো পেতে সাহায্য করেছি। যদি একজন শীতার্ত মানুষও এই আলোর উত্তাপে উপকৃত হন আমি কৃতার্থ বোধ করব।

কলকাতা-৭০০ ১০৪

স্বপন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

শান্তিনিকেতন	.....	১৯
অমিতার অমর্ত্য	.....	২৪
পাঠভবনে	.....	২৬
প্রেসিডেন্সিতে অমর্ত্য	.....	৩৭
অধ্যাপক অমর্ত্য সেন	.....	৪৩
নবনীতার সঙ্গে পরিচয় ও পরিণয়	.....	৪৭
লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও অমর্ত্য	.....	৬৫
দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান	.....	৬৭
স্ত্রী এভা কলোরনি, ইন্দ্রাণী, কবীর	.....	৮১
অর্থনীতি ও নীতিশাস্ত্র	.....	৮৫
সেন দারিদ্র্য-সূচক	.....	৯২
লিঙ্গ বৈষম্য ও নারী বঞ্চনা	.....	৯৯
বাজার অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ	.....	১০৮
মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং রাষ্ট্রীয় কর্মোদ্যোগ	.....	১১২
ট্রিনিটির ৩৬-তম মাস্টার	.....	১২১
প্রাথমিক শিক্ষায় গুরুত্ব	.....	১২৫
রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ-স্বীকার	.....	১৩৪
"পুবের কৌশলের" স্বরূপ অনুসন্ধান	.....	১৪৩
গণতন্ত্রের ভূমিকা	.....	১৫৬
নোবেল পুরস্কার	.....	১৬৪
প্রতীচী ট্রাস্ট	.....	১৬৮
ইতিহাস সচেতনতা ও নিজ মাতৃভূমি	.....	১৭৯
ভারতে শ্রেণি	.....	১৯১

বিশ্বপথিক অমর্ত্যর অব্যাহত মর্তসাধনা ২০৩
ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর "হিন্দুধর্ম" গ্রন্থের ভূমিকা—
প্রসঙ্গ ভারতে সাম্প্রদায়িকতা ২০৫
পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন : জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলন ২১২
তর্কপ্রিয় ভারতীয় ২৩১
অমর্ত্য ভাবনায় পরিচিতি ও হিংসা ২৪১
ভারত বনাম চিন—উন্নয়নের স্বরূপ ২৫১
বই-এ ব্যবহৃত অধ্যাপক অমর্ত্য সেন-কৃত পরিভাষা ২৬৫
অধ্যাপক অমর্ত্য সেন রচিত বই ২৬৬
অর্থনীতির পুরস্কার ২৬৮
বিশিষ্ট পদ ২৭২

শান্তিনিকেতন

সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চেতনার মিলনতীর্থ শান্তিনিকেতন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও চেতনার সার্থক উন্মেষের লক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। এই আশ্রমের প্রথম যুগের শিক্ষক আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।

বিক্রমপুরের সোনারঙের বাড়ি থেকে রবীন্দ্র আদর্শ ও মনোদর্শনের আকর্ষণে কবির ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষিতিমোহন চলে আসেন শান্তিনিকেতনে। ১৯০৮ সালে গ্রীষ্মের পর ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে এসে কাজে যোগ দেন। আর তার আট মাস পরে শীতকালে ক্ষিতিমোহনের স্ত্রী কিরণবালা দেবী এলেন শান্তিনিকেতনে। স্বামীর অজানা কর্মস্থলটি কেমন তা দেখে যাওয়ার জন্যই কিরণবালা এসেছিলেন শান্তিনিকেতন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। সেই থেকে ৯৫ বছর বয়স অবধি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমের শ্রীপল্লির নিজের বাড়ি থেকে ১৩৯১ বঙ্গাব্দে তিনি অমর্ত্যলোকে যাত্রা করেছিলেন।

ক্ষিতিমোহন যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন দেহলি বাড়িতে। দোতলার ঘরে থাকতেন কবি আর নীচের ঘরে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের কন্যা বেলা আর মীরা। রবীন্দ্রনাথ দেহলির নিজের ঘরখানি ছেড়ে দিলেন ক্ষিতিমোহন আর কিরণবালার জন্য। নিজে চলে গেলেন শান্তিনিকেতন-বাড়িতে। পরে রবীন্দ্রনাথের দেহলি-বাড়ির পাশেই "নতুন বাড়িতে" থাকতেন তাঁরা।

দরিদ্র শান্তিনিকেতনে কবির আদর্শের অনুপ্রেরণায় মোহিত হয়েছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন। তাঁর সারাদিন কাটত অধ্যয়ন আর অধ্যাপনায়। সময় পেলেই কবির সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলত। যতদিন কবি বেঁচে ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর। শান্তিনিকেতনে উত্তরায়ণে বেড়াতে বেড়াতে দুজনে মিলে কত গভীর তত্ত্বকথাই না আলোচনা করতেন। বাড়িতে এসে ক্ষিতিমোহন সব লিখে রাখতেন। স্ত্রী কিরণবালা

ক্ষিতিমোহনের কাছে শুনতেন সেই আলোচনার বিষয়বস্তু। জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে আচার্য ক্ষিতিমোহনের উপর নির্ভর করতেন। কবি যখন 'সভ্যতার সংকট' লেখেন তখন তিনি খুবই অসুস্থ। এই প্রবন্ধটি সভায় পাঠ করার দায়িত্ব দেন আচার্য ক্ষিতিমোহনকে।

ক্রমশ আশ্রমের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন ক্ষিতিমোহন আর কিরণবালা। ক্ষিতিমোহন সেনের পাশের বাড়িতে থাকতেন অভিধান-প্রণেতা পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। ভোরবেলা উঠে মাঝে-মাঝে তিনি সোজা চলে যেতেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনের বাড়ি এসে উপস্থিত হতেন। অত ভোরে রবীন্দ্রনাথের গলা পেলে সবাই চমকে বাইরে আসতেন। উলটোজামা পরেই কখনও-কখনও ঘর থেকে বের হতেন ক্ষিতিমোহন; রবীন্দ্রনাথ তখন বলছেন :

ঊষা সমাগত
রবির উদয় হয়েছে
ক্ষিতির দ্বারের সম্মুখে।
ক্ষিতি কি জাগ্রত নন?

ক্ষিতিমোহন আর কিরণবালার আড়াই বছরের দুষ্টু মেয়ে অমিতা কোন্ ফাঁকে উঠে যেত দেহলি বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যেখানে কবি বসে রচনা করে চলেছেন তাঁর অমর কাব্যগাথা। কবির লেখা যেত থেমে। সহাস্যে শিশু অমিতার ডানাদুটি ধরে রবীন্দ্রনাথ তাকে তুলে নিয়ে এসে ক্ষিতিমোহনের স্ত্রীকে ডেকে বলতেন, কিরণ, অমিতাকে সাম্‌লাও, আমার লেখাপড়া একদম বন্ধ।

অফুরান প্রাণশক্তিতে ভরপুর শিশু অমিতা দিনু ঠাকুরের (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ফেলে দেওয়া সিগারেটের কৌটোতে কাঁকর ভরে মাথায় ঢালছে দেখে রবীন্দ্রনাথ গেয়ে উঠলেন—

এই তো ভাল লেগেছিল।
ছোটমেয়ে ধূলায় বসে
খেলার সাজি, আপনি সাজায়।

রবীন্দ্রনাথ তখন সবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। আপন সাধনভূমিতে সাহিত্যচর্চায় তিনি তন্ময় হয়ে থাকেন। বিশ্বপথিকের চলার সাথি যে কজন তাঁদের অন্যতম ক্ষিতিমোহন। তাঁর সংগৃহীত কবীরবাণী অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন One Hundred Poems of Kabir (1914)। ভারতীয়

মধ্যযুগের সন্তবাণী এবং বাউল সংগীত সংগ্রহে ক্ষিতিমোহনের নাম চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ মজা করে বলতেন- "একাই নবরতন ক্ষিতিমোহন"। স্ত্রী কিরণবালা নিজের সন্তান অমিতার সঙ্গে সমস্নেহে পালন করতেন আশ্রমের সব শিশুকে। খড়ের চাল, মাটির বাড়ির দীনতার কোনো চিহ্ন পড়েনি কিরণবালার হৃদয়ে। মনের আনন্দে সৃষ্টিশীল দিনগুলি কাটত সাহিত্যসাধনায়, শিল্প ও সংগীতচর্চায়। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর কাছে চলত শিল্পকলা শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে আশ্রমবাসিনীরা হাতে লিখে পত্রিকা প্রকাশ করলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নাম দিলেন - 'শ্রেয়সী।' কিরণবালা হলেন সম্পাদিকা। যখন পত্রিকা ছেপে বেরোতে শুরু করল তখন প্রুফ দেখার দায়িত্বও নিতে হল কিরণবালাকে। সাহিত্যচর্চা এবার বিশেষ ধারায় বইতে লাগল।

কিরণবালা খুব সুন্দর আলপনা দিতে পারতেন। শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধি রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে এলে সভাস্থলে আলপনা দেওয়ার ভার পড়ল কিরণবালার উপর। রবীন্দ্রনাথের মাটির বাড়ি শ্যামলীর গায়ে সুন্দর একটি মাটির মূর্তি আছে - একটি চাষী গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আর চাষি-বউ খাবার হাতে দাঁড়িয়ে। এই অসাধারণ মাটির মূর্তিটি গড়ে তোলেন কিরণবালা।

রবীন্দ্রনাথের নিকটসান্নিধ্যে বড়ো হয়ে উঠতে লাগল ছোট্ট মেয়ে অমিতা। শালবীথির পাশে বীথিকা ঘরে রবীন্দ্রনাথ তাদের পড়াতেন রামায়ণ, মহাভারত। আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ নিতেন ইংরেজি ক্লাশ। বকুলবীথিতে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠ নিতেন বাবা ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ বলতেন, রবীন্দ্রসাহিত্য আমার থেকে অনেক ভালো পড়ান ক্ষিতিবাবু। গান শেখাতেন রবীন্দ্রনাথের সকল গানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে চলত শিল্পচর্চা। রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে ক্ষিতিমোহন আলো দেখিয়ে অমিতাকে জীবনের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সেই পথে চলতে চলতে একদিন এসে হাত ধরলেন জমিদারপুত্র বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. আশুতোষ সেন। কিরণবালা সুরুলের বনভোজন থেকে দীর্ঘপথ জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদের সঙ্গে যখন হাঁটতে হাঁটতে শান্তিনিকেতনে ফিরতেন তখন হঠাৎ দেখতেন রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অপেক্ষা করছেন পিছিয়ে পড়া কিরণবালার জন্য। তারপর সস্নেহে কাছে গিয়ে বলতেন, কিরণ আমার কোলে একটু দাও, এতটা পথ তুমি একলা পারবে না। এই বলে রবীন্দ্রনাথ অমিতাকে কোলে নিয়ে পথ হাঁটতেন। আজ সেই কোলের শিশুটি বধূ বেশে

স্বামীর ঘরে যাবে। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করে কবিতা লিখলেন—

তোমারে হেরিনু বধূবেশে
নির্ঝরিণী নৃত্যশীলা
সহসা মিলিছ সরোবরে
চটুল চঞ্চল লীলা
গভীরে করিছ মগ্ন।
নির্ভয়ে নিখিল করি পণ
নবজীবনের সৃষ্টি রহস্য করিছ উদ্‌ঘাটন।

১৩৩৯ সালের ৪ আষাঢ় আশ্রমকন্যা অমিতার বিয়ে হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সয়েল-কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ড. আশুতোষ সেনের সঙ্গে। কৃতী ও ধনী পাত্রের দরিদ্র আশ্রমিকাকে পাত্রী হিসেবে পছন্দ করার প্রধান কারণ সে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা শিষ্যা। গুরুপল্লির খড়ের চালের মাটির বাড়িতে কন্যাকে দেখলেন জমিদারপুত্র আশুতোষ সেন। বিয়ের পর বরকনে জোড়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে। রবীন্দ্রনাথ আশুতোষকে আশীর্বাদ করে বললেন, এরা আমার আশ্রমে একটু অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। ওর মন বুঝতে চেষ্টা করো। ও তোমায় সুখী করবে।

কবিগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে নতুন জীবন শুরু হল অমিতা-আশুতোষের।

১৯০১ সালে যে বছর রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন আশুতোষ সেনের জন্ম সেই বছর নভেম্বর মাসে। সারদা প্রসাদ ও জগৎলক্ষ্মী সেনের কনিষ্ঠ পুত্র আশুতোষ ঢাকার ওয়াড়ি অঞ্চলে ১৪ নম্বর লারমিনি স্ট্রিটে থাকতেন। আদি নিবাস মানিকগঞ্জের মত্ত গ্রাম। এই মত্ত গ্রামের সঙ্গেও আশুতোষ সেনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯২১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং ১৯২৪ সালে তিনি অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি এস সি এবং রসায়নে এম এস সি করেন। এরপর পুসার ইম্পিরিয়াল অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে কৃষি নিয়ে গবেষণা করে ইংল্যান্ডে পি এইচ ডি করতে যান। ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত রদামস্টেড অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সপেরিমেন্ট স্টেশনে আশুতোষ কৃষি বিজ্ঞানী হ্যারিসনের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯২৯-এ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডি লাভের পর তিনি দেশে ফিরে ঢাকায় অধ্যাপনা ও গবেষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি জ্ঞান মুখার্জির সঙ্গে একত্রিত হয়ে সয়েল-সায়েন্স বিভাগ স্থাপন করেন।

আশ্রমকন্যা অমিতা সেনকে বিয়ে করার সুবাদে আশুতোষ সেনের সঙ্গে

শান্তিনিকেতনের সম্পর্ক নিবিড় হয়। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করে চারদিকের গ্রামগুলির পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তখন চতুর্দিকে গ্রামোন্নয়নকেন্দ্রিক নানা কাজ চলছে। রথীন্দ্রনাথ ড. আশুতোষ সেনকে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কাজে সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানান। আশুতোষ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এবং রথীন্দ্রনাথের কথা মতো নানা পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেন ও কৃষি-উন্নয়ন সংক্রান্ত তাঁর ভাবনা-চিন্তার নানা প্রায়োগিক বিষয় তাঁর হাতে তুলে দেন। শান্তিনিকেতনে জলের কষ্ট চিরদিনের। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমিকদের জলের কষ্ট নিবারণের জন্য কম চেষ্টা করেননি। সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। ১৯৩২ সালে শান্তিনিকেতনে এসে আশুতোষ সেন শান্তিনিকেতনে জলের কষ্ট দেখে খুব বিচলিত হয়েছিলেন এবং সেই থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে মাটির নীচে কোন্ স্তরে মিষ্টি জল পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁর প্রচেষ্টা অনেকখানি সফল হয় তবে অনেক পরে। ১৯৪১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে নতুন বাড়ি নির্মাণ করেন যার নাম প্রতীচী। শ্রীমতী অমিতা সেনের পিতা ক্ষিতিমোহন সেন বাড়ির নাম রাখেন প্রতীচী কারণ সেই সময় প্রতীচী বাড়িটি ছিল শান্তিনিকেতনের পশ্চিমপ্রান্তে। ১৯৬৪ সালে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর ড. আশুতোষ সেন প্রতীচী বাড়িতেই থাকতেন। ড. আশুতোষ সেন নানাভাবে শ্রীনিকেতনের কাজে সাহায্য করতেন। পল্লিশিক্ষা কেন্দ্রকে সাহায্য করা ছাড়াও বীরভূমের এক ফসলি জমিকে বহু ফসলি করে তোলার কাজে ড. আশুতোষ সেন প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

ড. আশুতোষ সেন ১৯৭১ সালে প্রয়াত হন।